স্ত্রী প্রমিলাদেবী এখনও চোখ বন্ধ করলে দেখতে পান নেতাজির সঙ্গে হাতির পিঠে যাচ্ছেন বিভূতিবাবু

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট : পুরশুড়া থানার ভূঁইয়া গ্রামে ৺ যতীন্দ্রনাথ সরকার এবং শৈলবালা দেবীর কোলে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভূতিভূষণ সরকার। যতীন্দ্রনাথবাবুর সন্তানদের মধ্যে বিভূতিবাবু ছিলেন সবার বড়। তিনি ছোট থেকেই দেশমাতৃকার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ফলে মাধ্যমিকের পর আর লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি। বয়স যত বাড়তে থাকে তত বেশি করে স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে তৎকালীন আরামবাগ মহকুমার গান্ধী জাতীয় কংগ্রেসের নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সান্নিধ্যে আসেন। এরফলে তাঁর কর্মধারা অনেকগুন বৃদ্ধি পায়। আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন চরমপন্থী ধারার মানুষ। কখনও কোনও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করতেন না। আনুমানিক ১৯৩০ সালের পর কোনও এক সময় ঘাটাল থানার কোনও এক দারোগা ইংরেজ তাঁবেদার হিসাবে কাজ করছিলেন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ধরিয়ে দিতেন। বিভূতিবাবুর উপর দায়িত্ব পড়েছিল ওই দারোগাকে শাস্তি দেওয়ার। বিভূতিবাবু ঘাটাল বাজারের কাছে ওই দারোগাকে চরম শাস্তি দিয়েছিলেন। যার ফলে তাকে দীর্ঘদিন হাজতবাস করতে হয়।

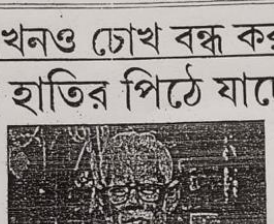

ওই সময় বিভূতিবাবুর হাতের প্রতিটি আঙুলে সূচ ফুটিয়ে অত্যাচার চালানো হয়েছিল। তাই শেষ জীবনে তাঁর হাতের সব আঙুলই অকেজো হয়ে যায়। ১৯৪০-৪১ সাল নাগাদ বিভূতিবাবু নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সাথে পুরশুড়া থেকে হাতির পিঠে চেপে দলীয় কর্মসূচীতে চন্দ্রকোণার কালিকাপুরে যান। সেখানে যে জায়গায় নেতাজী ভাষণ দিয়েছিলেন, সেখানে নেতাজীর একটি আবক্ষ মূর্তি ও নেতাজীর নামে একটি বিদ্যালয় রয়েছে। উল্লেখ্য, প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভূতিবাবুকে আরামবাগ, চুঁচুড়া জেলে বহু দিন কাটাতে হয়। নিরামিষাশী বিভূতিবাবু প্রফুল্ল সেনের নির্দেশে রোগ জ্বালার হাত থেকে

মুক্ত থাকার জন্য প্রতিদিন দু-কোয়া করে রসুন খেতেন।

যার ফলে দীর্ঘদিন তাঁকে কোনও কঠিন রোগ গ্রাস করতে পারেনি। তাঁর ব্যক্তিগত সখ ছিল ফটোতোলা। কঠিন স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াইয়ের মধ্যেই গানবাজনাকে তিনি খুব ভালো বাসতেন। এসরাজ বাজানোতে তিনি খুব দক্ষ ছিলেন। সেই এসরাজটি আজও অক্ষত অবস্থায় ছোট ছেলে সুশান্ত সরকারের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর পোষাক ছিল একেবারে স্বাধীনতা সংগ্রামীর খাদির ফুলশার্ট ও ধুতি।

পায়ে হাওয়াই চপ্পল। বিলাসিতা নামক বস্তু থেকে তিনি ছিলেন বহুদূরে। যদিও স্বাধীনতার পর রাজনীতি থেকে তিনি নিজেকে দূর সরিয়ে নিয়েছিলেন। সমাজসেবা কাজে নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন।

তাঁর সেই চিন্তাভাবনাকে বাস্তবায়িত করে চলেছেন তাঁর সুযোগ্য সন্তানরা। তাঁর নামে ভূঁইয়া গ্রামে একটি ট্রাস্ট তৈরী করে নিয়মিতভাবে মানুষের সেবা কাজ করে চলেছেন। তাঁর নামে রয়েছে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি অনাথ আশ্রম, একটি অবৈতনিক শিক্ষা কেন্দ্র। এছাড়াও প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে ২০০ জন দুঃস্থ মানুষকে চশমা দান করেন তাঁর সন্তানরা। বিভূতিভূষণবাবু তাঁর শেষ অধ্যায় কাটিয়েছিলেন কামারপুকুরের একটি মাটির বাড়িতে। যা আজও অক্ষত আছে।

তিনি কামারপুকুরে থাকাকালীন লাহাবাজারে ৺গোপাল চন্দ্র ঘোষের বিশ্বভারতী স্টুডিওতে প্রতিদিন যেতেন। সেভাবে ফোটো তোলা তোলানোর সখ পূরণ করতেন। তাঁর এই আত্মত্যাগের যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেছিল ভারত সরকার। বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল তাম্রপত্র। এবং জীবন ধারনের জন্য দেওয়া হয়েছিল পেনশন। সেই পেনশন আজও পেয়ে চলেছেন তাঁর স্ত্রী প্রমিলা সরকার। প্রমিলাদেবী বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটীতে এক সন্তানের কাছে থাকেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় প্রয়াত প্রফুল্লচন্দ্র সেন ডোঙ্গলের সাগর কুঠী নির্মাণ করে একদিকে সমাজসেবা অন্যদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজ চালাতেন ঠিকই কিন্তু তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূল ঘাঁটি ছিল প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভূতিভূষণ সরকারের শ্যালিকার বাড়ি শ্রীমন্তপুরের রায় পরিবারের গোয়াল ঘরের দোতলায়। সেখান থেকেই প্রফুল্লবাবু স্বাধীনতা সংগ্রামের বেশির ভাগ কাজ পরিচালনা করতেন। বিভূতিবাবু ছিলেন প্রফুল্ল সেনের বিশ্বস্ত সেনাপতিদের একজন।

Page-11, Page 12